ভারতের তিন সত্যদ্রষ্টা বিবেকানন্দ, কেশবচন্দ্র সেন এবং গান্ধীজির ওপর শ্রীচৈতন্য সংস্কৃতির প্রভাব

অসীম বিশ্বাস

অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, ইতিহাস বিভাগ,

সুবর্ণরেখা মহাবিদ্যালয়, গোপীবল্লভপুর, ঝাড়গ্রাম

সারসংক্ষেপ: *শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও তাঁর বৈষ্ণব ধর্ম ; বাংলা তথা ভারতবর্ষের বৈষ্ণব সাংস্কৃতিক ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। যার অঙ্গুলিহেলনে ভারতীয় ভাষা হিসেবে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে সঙ্গে আনুষঙ্গিক বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় বিশেষ করে সংস্কৃত ,ওড়িয়া ,সুবর্ণরৈখিক সহ প্রভৃতি ভাষা সমৃদ্ধতর হয়েছিল। এই সব ভাষায় সৃষ্ট বৈষ্ণব সাহিত্য ,কাব্য, দর্শন ভারতবর্ষের মানবিক ধর্মকে বিশ্বধর্ম পরিণত করেছিলেন। যার প্রভাব স্বামী বিবেকানন্দ সহ কেশব চন্দ্র সেন ও মহাত্মা গান্ধীর উপরেও পড়েছিল। এদের ধর্মনৈতিক ,সামাজিক, রাজনৈতিক, দার্শনিক , মানবিক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি গুণাবলির ওপর এবং চেতনা ও মননে শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্ম প্রভূত প্রভাব পড়েছিল। শ্রীচৈতন্যের আধ্যাত্মদর্শন ও চিন্তাধারা পরবর্তীকালে ধর্মীয় ও সামাজিক গণ্ডি পেরিয়ে রাজনৈতিক দর্শনের ক্ষেত্রে প্রভূত লাভ করেছিল। স্বামী বিবেকানন্দের ধর্মীয় চেতনা ও আত্মদর্শন কোথায় যেন শ্রীচৈতন্যের ধর্মীয় চিন্তাধারার সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। আবার, কেশব চন্দ্র সেনের ধর্মীয় চিন্তাধারা ও সামাজিক কার্যক্রম এর মধ্যেও শ্রীচৈতন্য ধর্ম একটি বিরাট জায়গা করে নিয়েছিল। অপরপক্ষে গান্ধীজীর জীবনেও বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব ছিল অপরিসীম। তাঁর জীবন দ-র্শন বৈষ্ণবীয় পরিকাঠামোর মধ্যে গড়ে উঠেছিল। এই ত্রয়ী মহান সত্যদ্রষ্টা আর চিন্তা ধারা ও আত্ম দর্শন শ্রীচৈতন্য দর্শন এক নতুন মাত্রা সংযোজন করেছিল। ভারতবর্ষের জাতীয় জনজাগরণের এবং ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে যে উৎসাহ ও মন্ত্র পাথেয় করে প্রখর শক্তি দ্বারা জাতিকে নতুন মন্ত্রী উজ্জীবিত করেছিলেন তার উৎসমুখ হিসাবে শ্রীচৈতন্যদেবের ধর্মীয় দর্শন তথা বৈষ্ণবীয় আচারবিচার ও ধর্মীয় চেতনা বিশেষভাবে তাদের ওপর বিস্তার লাভ করেছিল-। উনিশ - বিশ শতকের ভারতীয় সমাজে ধর্মীয় প্রেক্ষাপটে জাতপাত নির্ভরতা, অস্পৃশ্যতা,জাতি বৈরিতা বা জাতিভেদ ও জাতি বৈষম্য, লিঙ্গ বৈষম্য, নারীর অবমাননা, অর্থনৈতিক বৈষম্য সামাজিক ও জাতীয় উন্নয়নে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল; সেখানে এঁরা শ্রীচৈতন্যের ধর্মান্দোলন দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অগণিত সাধারণ মানুষকে মুক্তির পথ দেখিয়েছিল। ষোড়শ শতকে শ্রীচৈতন্যের ধর্মান্দোলন বাংলা সহ দেশের অগণিত মানুষকে যে মুক্তির পথ ও বেঁচে থাকার মন্ত্র যুগিয়েছিলতার প্রভাব উনিশ , শতকের জাতীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যেও প্রভাবিত হয়েছিল। জাতিহীন বৈষ্ণবীয় ধর্মে যেমন স্থান পেয়েছিল নিম্নবর্ণের হিন্দু সহ সমাজের এক বৃহৎ অংশ যারা ছিলেন মহিলা। তেমনি মুসলমানসহ ভারতবর্ষের বিভিন্ন জাতির ও বিভিন্ন ধর্মের মানুষের অংশগ্রহণ বৈষ্ণব ধর্ম কে ভারতীয় ধর্মের গণ্ডি অতিক্রম করে বিশ্বধর্মেপরিণত করেছিলেন।তাইআমি আমার এই নিবন্ধের , ভারতের তিন*

Society Language and Culture

মহাপুরুষের ওপর শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত চৈতন্যধর্ম বৈষ্ণবধর্ম বা বৈষ্ণব সংস্কৃতির কতটা প্রভাব পড়েছিল এবং ভারতের জাতীয় জীবন এর দ্বারা কতটা সঞ্জীবিত হয়েছিল সে সম্পর্কে আলোকপাত করার চেষ্টা করেছি।

সূচক-শব্দ: *বৈষ্ণবধর্ম, চৈতন্যসংস্কৃতি, বিবেকানন্দ, হরিনামসংকীর্তন, গোপীপ্রেম, কেশবচন্দ্র, নববিধান-ব্রাহ্মসমাজ, অসহযোগ, আইন-অমান্য, নিম্নবর্গ, হরিজন।*

১

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জন্ম ১৪৮৬ খ্রিস্টাব্দে। তার প্রায় ৪০০ বছর পরে ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব। একজন জন্মেছিলেন পঞ্চদশ শতকের মুসলিম শাসক ও রাজনৈতিক আবহে এবং বাংলা সহ ভারতবর্ষের সামাজিক জীবনের শতধা বিভক্ত জাতপাত নির্ভর সামাজিক পরিবেশে। অপরজন জন্মগ্রহণ করেছিলেন উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে উপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসনের রাজনৈতিক পরিস্থিতি মধ্যে; যখন ঔপনিবেশিক শাসনের কালো মেঘ ভারতবর্ষের রাজনীতি-সমাজনীতি অর্থনীতি ধর্ম নীতি ও সাংস্কৃতিক জগতকে নতুনভাবে ভাবতে শিখিয়েছিল। রাষ্ট্র ও সমাজ নেতারা নবনির্মাণ ভারতবর্ষের জনজীবনে এক অভিনব চিন্তা চেতনার উন্মেষ ঘটাতে সক্ষম হয়েছিল। সেইরকমই পেক্ষাপটে উনিশ শতকে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ষোড়শ শতকীয় বৈষ্ণব চিন্তাধারা তথা চৈতন্য সংস্কৃতি বাংলা সহ গোটা ভারতবর্ষের ওপর তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক প্রভাব ফেলেছিল। স্বামী বিবেকানন্দ এবং শ্রীচৈতন্যদেব দুজনেই ছিলেন নবজাগরণের কর্ণধার তথা প্রাণপুরুষ। দুজনেই স্ব-স্ব ক্ষেত্রে যুব প্রবর্তক। যুগের প্রয়োজনে তাঁরা মানব মুক্তির দূত হিসাবে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। যদিও চৈতন্যের বৈষ্ণব ধর্ম বা চৈতন্য সংস্কৃতির ভাবধারায় বিবেকানন্দ প্রভাবিত হয়েছিলেন কিনা, তা নিয়ে আলোচনা বিস্তর চলতে পারে। তবে তা কোন সরল সিদ্ধান্তে আসার জন্য নয়। এই দুই মনীষীর চিন্তা-চেতনার সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। প্রয়োগ পদ্ধতিতেও কিছু মিল ছিল তাদের মধ্যে। সমাজের হিতসাধনে বঙ্গভূমিতে যত মনীষীর আবির্ভাব ঘটেছে তাঁদের মধ্যে এই দুজনেই অন্যতম শ্রেষ্ঠত্বের দাবি রাখে। ইতিহাসে দুজনেই উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। চৈতন্য ও বিবেকানন্দ দুজনেই ধর্মের ধারা ধারা অনুসরণ করে সমাজ সংস্কারে ব্রতী হয়েছিলেন। শ্রীচৈতন্যের সময় বাংলা তুর্কি মুসলমান শাসনের পদানত ছিল। আর বিবেকানন্দের সময় বাংলা ইংরেজ শাসনাধীনে ছিল। দুজনের সময় মাতৃভূমি বিদেশি শাসকের নিয়ন্ত্রণাধীন। ঐ সঙ্কটকালে এই দুই মনীষী হিন্দু ধর্মের স্বরূপ সহজ ও সাবলীল ব্যাখ্যায় সর্বস্তরের সাধারণ মানুষের অন্তরে পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। হিন্দু ধর্মের চলমান সত্তা। ধর্ম নিয়ে একশ্রেণীর মানুষের আধিপত্য চূর্ণ করে কুসংস্কারমুক্ত করতে দুজনেই বাংলা তথা ভারতবর্ষকে নতুন পথের দিশা দেখিয়েছিলেন। চৈতন্যের ধর্ম আন্দোলনের মূল সুর ছিল ভক্তি। তাঁর ভক্তি আন্দোলনের গভীরতা ও প্রসারতা বিবেকানন্দকে প্রভাবিত করেছিল তা তিনি দীপ্ত কণ্ঠে স্বীকার করে বলেছিলেন, "একবার মাত্র এক মহতী প্রতিভা সেই 'অবিচ্ছিন্ন অবচ্ছেদক' জাল করিয়া উত্থিত হইয়াছিলেন-- ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। একবার মাত্র বঙ্গের আধ্যাত্বিক তন্দ্রা ভাঙ্গিয়াছিল। কিছুদিনের জন্য উহা ভারতের অপরাপর প্রদেশের ধর্ম -জীবনের সহভাগী হইয়াছিল"।[১]

জয়দেব, চন্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস, কৃষ্ণদাস প্রভৃতি কবিদের কাব্য সুষমা মানুষকে উদার বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। অনুরূপভাবে চৈতন্যের ধর্ম আন্দোলন প্রাথমিকভাবে উচ্চবর্ণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও অচিরেই নিম্নবর্ণের এবং নিম্নবর্গের এমনকি মুসলমান ধর্মের মানুষকেও ব্যাপক ভাবে আকৃষ্ট করেছিল। এই আন্দোলন যখন সমাজে বিস্তার লাভ করছে ততদিন বহু মানুষের ইসলামে ধর্মান্তকরণ ঘটে গেছে মুসলমান শাসক দ্বারা। এর পাশাপাশি উচ্চবর্ণের শোষণ-নিপীড়নের হাত থেকে রক্ষা পেতে নিম্নবর্গীয় মানুষেরা অপেক্ষাকৃত উদার ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার দিকে ঝুঁকে পড়েছিল এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধি করেছিল। চৈতন্য প্রবর্তিত ধর্ম আন্দোলন এই ধর্ম পরিবর্তনকে অনেকাংশে রুখে দিতে পেরেছিল। চৈতন্য ধর্ম ও সংস্কৃতিতে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল মানুষ। মানুষকে কেন্দ্র করেই চৈতন্য সংস্কৃতি ভারতবর্ষের গণ্ডি অতিক্রম করে আন্তর্জাতিকতা লাভ করতে সক্ষম হয়েছিল। এই ধর্ম আন্দোলনে সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়েছিল প্রেম অহিংসা—যা বৌদ্ধ বা জৈন ধর্মে পরিলক্ষিত হয়। জাতপাতের মত সংস্কার আন্দোলনে স্থান পায়নি। চৈতন্যের প্রভাবে সেইসময় হরিদাস ও রামদাসের মত মুসলমান ধর্মাবলম্বীরাও বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েছিল। সনাতনপন্থী ব্রাহ্মণেরা কখনোই এই আন্দোলনকে উদারদৃষ্টিতে দেখেননি। শূদ্র শ্রেণীভূক্ত মানুষদের দক্ষ যোগদান তাদের উষ্মার মূল কারণ ছিল। সামাজিক শোষণ ও নিপীড়নের চাপে শূদ্র শ্রেণীভূক্ত মানুষের বরাবরই ধর্ম পরিবর্তনের প্রতি ঝোঁক থাকে। এক্ষেত্রেও তা লক্ষ্য করা যায়। সেই কারণেই বিগত দিনে ইসলামে ও তারপরে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হয়ে যায় অন্ত্যজ শ্রেণীর অসংখ্য মানুষের। সেই একই কারণে শ্রীচৈতন্যের উদারনৈতিক প্রেম-ভালোবাসা সম্বলিত আন্দোলনে তারা শামিল হয়েছিলেন। এই ব্যাপক যোগদানের আরও একটি কারণ যে তাদের ধর্মান্তকরণ হচ্ছে না। কেবল হিন্দু ধর্মের আরেকটি শাখার অনুসারী হচ্ছে। সনাতনপন্থীরা শূদ্রদের এই যোগদানের বিষয়টি আদৌ ভালো চোখে দেখেননি। সনাতনপন্থীদের জাত্যাভিমান ও ধর্মীয় গোঁড়ামিকে শ্রীচৈতন্য তাঁর প্রবর্তিত ধর্ম আন্দোলনে প্রশ্রয় না দিয়ে সাধু-পাপী, হহিন্দু-মুসলমান পবিত্র-অপবিত্র, বেশ্যা-পতিত, নারী-পুরুষ সকলকেই প্রেমের আলিঙ্গনে আবদ্ধ করেছিলেন। ফলে এই আন্দোলন সমাজে আশ্রয়হীনদের নিশ্চিত আশ্রয়স্থল হয়ে উঠতে পেরেছিল। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কথায় 'চৈতন্যদেব বিকৃতির অবতার,জীবকে ভক্তি শিখাতে এসেছিলেন'। রামকৃষ্ণের শিষ্য বিবেকানন্দের চৈতন্য সম্পর্কে সশ্রদ্ধ উক্তি—"সমুদয় ভারতেই শ্রীচৈতন্যের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। যেখানেই লোকে ভক্তিমার্গ জানে। সেখানেই তাঁহার বিষয় লোকে আদরপূর্বক চর্চা করিয়া থাকে ও তাঁহার পূজা করিয়া থাকে। তাঁহার প্রভাব এখনো কিরূপে সমগ্র ভারতে কার্য করিতেছে। তিনি নগ্নপদে ভারতের দ্বারে দ্বারে বেড়াইয়া আচন্ডালকে ভগবানের প্রতি প্রেমসম্পন্ন হইতে ভিক্ষা করিতেন"।[২] কাছ থেকে না দেখলে ভারত ভারতবাসীকে জানা না বোঝা সম্ভব নয়--এই আত্মানুসন্ধান সত্যের দ্বারা উন্মোচন করে। বিভিন্ন ভাষাভাষী, বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন বর্ণের মানুষজনের কাছে গিয়ে পৌঁছাতে না পারলে কিভাবে সত্যাশ্রয়ী অনুসন্ধান হবে, কিভাবেই বা ভাবের আদান-প্রদান ঘটবে--এই সম্যক উপলব্ধির জন্য চৈতন্য ও বিবেকানন্দ পথে নেমে ভারত দর্শনে বেরিয়েছিলেন। বিবেকানন্দ এক জায়গায় বলেছেন,'পন্ডিত বংশের ব্রাহ্মণ সন্তান হয়েও কোন মহাজন কৃপায় এই ব্যক্তির সারা জীবন পরিবর্তিত হইয়া গেল। জগতে যত বড় বড় ভক্তির আচার্য হইয়াছেন, এই প্রেমোন্মত্ত চৈতন্য তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহার

Society Language and Culture

ভক্তির তরঙ্গ বঙ্গদেশে প্রবাহিত হইয়া সকলের প্রাণে শান্তি দিল। তাঁহার প্রেমের সীমা ছিল না। সাধু, পন্ডিত, পতিত সকলেই তাঁহার প্রেমের ভাগী ছিল। তিনি দয়া করিতেন, এবং যদিও তৎপ্রবর্তিত সম্প্রদায় ঘোরতর অবনতি প্রাপ্ত হইয়াছে তথাপি আজ পর্যন্ত উহা দরিদ্র, দুর্বল জাতিচ্যুত, পতিত কোন সমাজে যাহার স্থান নাই এই রূপ সকল ব্যক্তির আশ্রয় স্থল।[৩] বিবেকানন্দ ভক্তদের উদ্দেশ্যে বলছেন, 'জ্ঞানমিশ্র ভক্তির সঙ্গে ভগবানকে ডাকবে। ভক্তির সঙ্গে বিচারবুদ্ধি রাখবে। এছাড়া চৈতন্যদেবের থেকে আরো নেবে তার হৃদয়বেত্তা, সর্বজীবে ভালোবাসা, ভগবানের জন্য টান, আর তাঁর ত্যাগটা জীবনের আদর্শ করবে।[৪] শ্রীচৈতন্যের কাতর প্রার্থনা ছিল,' হে জগদীশ! আমি ধন, জন, কবিতা, সুন্দরী কিছুই প্রার্থনা করিনা। শুধু তোমার প্রতি জন্মে জন্মে যেন আমার অহৈতুকী ভক্তি থাকে।[৫] অন্তরের এই ভক্তি ও নিষ্কাম কর্ম ধর্মের ইতিহাসে এক নতুন পথের দিশারী। বিবেকানন্দ এই নিষ্কাম সাধনার কথা বলতে গিয়ে বলেছেন,--"মাতৃভূমির উপর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় একমাত্র কর্তব্য। তাঁর কথায়,'আগামী পঞ্চাশ বছর আমাদের গরীয়সী ভারতমাতাই আমাদের আরাধ্য দেবতা হউন, অন্যান্য দেবতা এই কয়েক বৎসর ভুলিলে ক্ষতি নাই। অন্যান্য দেবতারা ঘুমাইতেছেন, তোমার স্বজাতি- এই দেবতাই একমাত্র জাগ্রত। এখানেই বিবেকানন্দ বুঝিয়ে দিয়েছেন-কাকে ভালবাসতে হবে, কাকে সেবা করতে হবে। 'শিব জ্ঞানে জীবসেবা ও দরিদ্রনারায়ণ' রামকৃষ্ণের এই অমর কথাগুলি বিবেকানন্দ জনমানষে প্রচার করেছিলেন। তিনি উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন, 'তাহার নিকট দরিদ্র চির নিপীড়িত জনগণের উন্নতি নিজের মোক্ষ লাভের অপেক্ষা মহত্তর উদ্দেশ্য ও আদর্শ'। তাঁর দৃপ্তকণ্ঠ উচ্চবর্ণের মানুষদের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছিল, তোমরা হচ্ছ দশ হাজার বচ্ছরের মমি। যাদের 'চলমান শ্মশান'বলে তোমাদের পূর্বপুরুষরা ঘৃণা করেছেন, ভারতে যা কিছু বর্তমান জীবন আছে, তা তাদেরই মধ্যে। আর চলমান শ্মশান হচ্ছ তোমরা। এও বলেছেন,'তোমরা শূন্যে বিলীন হও, আর নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙ্গল ধরে, চাষার কুটির ভেদ করে, জেলে, মালো, মুচি, মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোড়, জঙ্গল, পাহাড়, পর্বত থেকে। এরা সহস্র সহস্র বৎসর অত্যাচার সয়েচে, নিরবে সয়েচে—তাতে পেয়েছে অপূর্ব সহিষ্ণুতা। সনাতন দুঃখ ভোগ করেছে--তাতে পেয়েচে অটল জীবনী শক্তি। শ্রীচৈতন্য যেমন জাতপাতের কৃত্রিম বেড়া ডিঙিয়ে অন্ত্যজ শ্রেণীভূক্ত মানুষজনকে বুকে টেনে ভক্তি আন্দোলনে শামিল করেছিলেন, বিবেকানন্দের দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশও সেরূপ ছিল।তিনি বলেছেন,'ভারতের মূল জাতীয় সমস্যা ও সংকট হলো ইতর সাধারণ মানুষের দারুন দারিদ্র ও চরম শিক্ষা'। এতে তাঁর অন্তরাত্মা ব্যথিত হয়ে উঠেছিল,"আমার মনে হয় এই জন সাধারণের প্রতি উপেক্ষায়ই একটি জাতীয় পাপ এবং ভারতবর্ষের পতনের অন্যতম কারণ। কোনো প্রকার রাজনীতিই সার্থকতা লাভ করিতে পারে না যতদিন না ভারতের জনগণের শিক্ষা ও খাওয়া-পরার পুনরায় সুষ্ঠু সমাধান হইতেছে। প্রকৃত পক্ষে তাহারা আমাদের দাসত্ব করিতেছে। যদি আমরা ভারতের পুনরভ্যুত্থান কামনা করি তবে তাহাদের জন্য কাজ করিতে হইবে"।[৬] বিবেকানন্দ এখানে সামাজিক বৈষম্যের কারণ উল্লেখ করে সরাসরি আঘাত করেছেন যাতে অচলায়তন ভেঙে জুড়িয়ে যায়। তিনি এও বলেছেন, "পৃথিবীর কোন ধর্মই হিন্দু ধর্মের ন্যায় নিম্ন এবং দরিদ্র শ্রেণীকে এভাবে পদদলিত করে নাই"।[৭] চৈতন্য সংস্কৃতি যেমন অন্ত্যজ সাধারণকে নিয়েই ভক্তি আন্দোলনে জোয়ার এনেছিলেন, বিবেকানন্দ ও বুঝেছিলেন যে শুদ্রদের অভ্যুত্থান অবশ্যম্ভাবী। তাই তিনি

বলেছেন, "জীবন সংগ্রামে সর্বদা ব্যস্ত থাকতে নিম্নশ্রেণীর লোকদের এতদিন জ্ঞানোন্মেষ হয়নি। এরা মানব বুদ্ধি-নিয়ন্ত্রিত কলের মত একইভাবে এতদিন কাজ করে এসেছে, আর বুদ্ধিমান চতুর লোকেরা এদের পরিশ্রম ও উপার্জনের সারাংশ গ্রহণ করেছে, সকল দেশেই ওই রকম হয়েছে। কিন্তু এখন আর সেকাল নেই। ইতর জাতিরা ক্রমে ওই কথা বুঝতে পাচ্ছে এবং তার বিরুদ্ধে সকলে মিলে দাঁড়িয়ে আপনাদের ন্যায্য পাওনা গন্ডা আদায় করতে ভিডিও প্রতিজ্ঞ হয়েছে।[৮]

ধর্মকে কেন্দ্র করেই ভারতে প্রথম গণজাগরণ আত্মপ্রকাশ করেছিল। ধর্ম আন্দোলন আত্মানুসন্ধানের মাধ্যমে আত্ম শনাক্তকরণের পথের নির্দেশ দেয়। তাতে আত্মসচেতনতা অবশ্যম্ভাবী। এই আত্মানুসন্ধানের পথটি পরিক্রমা করতে গেলে যে প্রক্রিয়া গ্রহণ করতে হয় তাতে প্রেম, ত্যাগ ও তিতিক্ষার প্রয়োজন। তবেই সনাক্তকরণ সম্ভব হয় সচেতন ও তার বৃত্ত সম্পূর্ণ হয়। শ্রী চৈতন্যদেব সমাজকে ঠিক এটাই করে দেখিয়েছিলেন। তাই দেখা যায় শুধুমাত্র হরিনাম সংকীর্তন—এই ধ্বনি উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ তরঙ্গের মত তার মানুষের অন্তরাত্মায় পৌঁছে বিস্ফোরণ ঘটায়। সব ভুলে মানুষ প্রেমোন্মাদ হয়ে ওঠে। জাতিগত কৌলিন্য, বর্ণিত বৈষম্য এক নিমেষে উধাও হয়ে যায়। ব্যক্তির প্রাধান্য লুপ্ত হয়ে সামগ্রিক শক্তি জাগ্রত হয়। মানুষের মধ্যে এই অখন্ড ঐক্যবোধ আনাই চৈতন্যের অভীপ্সা ছিল। এর আগে আর কোনো মনীষীর এইভাবে শুধুমাত্র ভালবাসা দিয়ে মানুষের মধ্যে ঐক্যবোধ জাগাতে সক্ষম হননি। অর্থ নয়, বিতরণ নয়, চেতনা সমৃদ্ধ হয় প্রেমে। এ এক অক্ষয় সম্পদ যা অর্জন করতে পারলে জীবন উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে ওঠে। বিবেকানন্দের দর্শন ছিল ধর্ম মানুষকে একটি সুন্দর জীবনে চলার পথে শক্তি যোগাবে। চেতনায় প্রাণ সঞ্চার করবে। ধর্মের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ নয়, নতুন ধর্মের উদ্ভব নয়, মানব ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করাই ছিল তাঁর প্রতিজ্ঞা। মানুষের মধ্যেও যে দেবতা আছেন তা প্রকাশ করাই ছিল তাঁর ধর্ম। তার মতে, "ধর্ম যদি মানুষের সর্বাবস্থায়, তাহাকে সহায়তা করতে না পারে, তবে উহার বিশেষ কোন মূল্য নাই, উহা কতগুলি ব্যক্তির মতবাদ মাত্র। তাই তিনি বলেছেন, "ওঠো, জাগো, অভীষ্ট লাভ না করিয়া থামিও না। শক্তি, ত্যাগ সেবা-ইহাই আমাদের মূলমন্ত্র।[৯] চৈতন্যের মত বিবেকানন্দও অখন্ড ঐক্যবোধে বিশ্বাসী ও জাতিভেদ, সাম্প্রদায়িকতা, অস্পৃশ্যতার তীব্র বিরোধী ছিলেন। তাই তাঁকে বলতে শোনা যায়, 'যে ধর্ম গরিবের দুঃখ দূর করতে পারেনা, মানুষকে দেবতা করে না, তা আবার কি ধর্ম? আমাদের ছুৎমার্গ, খালি আমায় ছুঁয়ো না, আমায় ছুঁয়ো না। আমার দেশের একটি কুকুরও যতক্ষণ অনাহারে থাকিবে, ততক্ষণ আমার সমগ্র ধর্মের কর্তব্য হইবে তাহাকে খাইতে দেওয়া। ভারতের কোটি কোটি আর্ত নরনারী শুষ্ক কণ্ঠে কেবল দুটি অন্য শুষ্ক কণ্ঠে কেবল দুটি অন্ন চাহিতেছে। তাহারা অন্ন চাহিতেছে, আর আমরা তাহাদিগকে প্রস্তরখন্ড দিতেছি। ক্ষুধার্ত মানুষকে ধর্মের কথা শোনানো বা দর্শনশাস্ত্র শেখানো তাহাকে অপমান করা"। অখন্ড ঐক্যবোধ জাগাতে কি প্রক্রিয়া গ্রহণ করতে হবে বিবেকানন্দ তারও নির্দেশ দিয়েছেন, "সমস্ত ত্রুটির মূলই এইখানে যে-সত্যিকারের জাতি, যাহারা কুটির বাস করে, তাহারা তাহাদের ব্যক্তিত্ব ও মনুষ্যত্ব ভুলিয়া গিয়াছে। পায়ের তলায় পিষ্ট হইতে হইতে তাহাদের মনে এখন এই ধারণা জন্মিয়াছে যে পদতলে নিষ্পেষিত হইতেই তাহাদের জন্ম। তাহাদের লুপ্ত ব্যক্তিত্ববোধ আবার ফিরাইয়া দিতে হইবে। তাহাদিগকে শিক্ষিত করিতে হইবে।[১০] সব মনীষীর আত্মদর্শন কোথাও কোথাও একসুরে প্রকাশিত হয়। তাই রবীন্দ্রনাথের কোথায়, 'মানুষের প্রকাশ সত্যে। এই সত্য যে কি তা উপনিষদে

বলা হয়েছে: আত্মবৎ সর্ব্ভূতেষু পস্যতি পস্যতি।তিনি সকল জীবকে আপনার মতো করে জানেন তিনি সত্যকে জানেন। আপনার মধ্যে সত্যকে যিনি এমনি করে জেনেছেন তাঁর মধ্যেও মনুষ্যত্ব প্রকাশিত হয়েছে, তিনি আপন মানব মহিমায় দেদীপ্যমান। সকলের মধ্যে আপনাকে ও আপনার মধ্যে সকলকে যিনি দেখতে পেয়েছেন তিনি আর গোপন থাকতে পারেন না, সকল কালে তার প্রকাশ”।[১১]

তাই দেখা যায়, দুই মহাপুরুষের মধ্যে সবচেয়ে বড় মিল, দুজনেই দুটো ঝড় বয়ে নিয়ে এসেছিলেন। লোকজনহিতের জন্য সুনামি সমগ্র বাংলাদেশের চিন্তাভাবনা আমূল বদলে দিয়েছে। স্বামীজি এবং শ্রীচৈতন্য দুজনেই যে ধারা বহন করেছেন সেটা পুরি সম্প্রদায়ের। স্বামীজীর কথায় 'বিধাতা কর্তৃক নির্দিষ্ট' সত্যিতো তাই। নিমাই সংসার করলেন, শচীমাতা ভাবলেন, বড় ছেলে সন্ন্যাসী হয়েছে, ছোট জনকে সংসারী করলাম, আর কোন চিন্তা নেই। শৈশবে যে ছেলের দুরন্তপনায় অনেকের চোখ বড় বড় হতো। পাড়ার যে গরিব মানুষটা বাজারে থোড়, মোচা,করার ডোঙ্গা,করা বেচতে। তাঁর নাম শ্রীধর- পন্ডিত হয়ে উঠেছিলেল। এ ঘটনা গল্প নয়, সত্যি। নিমাই শ্রীধরের ওপর উপদ্রব করতেন। সে কোথা থেকে দেবে? অনেক অনুনয় বিনয় করে নিজের অবস্থার কথা জানিয়ে তাকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করলেও নিমাই কিছু না নিয়ে যাবেন না। শেষে ঠিক হয়, শ্রীধর রোজ তাঁকে খাওয়ার জন্য এক খন্ড খোলা বিনা পয়সায় দেবে। সেই শ্রীধর রোজ গভীর রাতে নিজের ঘরে বসে উঁচু গলায় ভগবানের নাম সংকীর্তন করতেন। তাঁর প্রতিবেশীরা যারা বিষয়ে ছিলেন, উপহাস করে বলতো--পেটে খিদে থাকলে তবে লোকে নাম কীর্তন করে। এই রকম একটা সামাজিক অবস্থা থেকেই আস্তে আস্তে নামকীর্তনকে সমাজগ্রাহ্য শুধু নয় সমাজের উপাস্য করে তুলেছিলেন তিনি। অন্যদিকে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে যে ঘূর্ণাবর্তের সূচনা হয়েছিল, স্বামী বিবেকানন্দ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বই নিয়ে গেছেন সেই ঝড়। মানুষ উদ্বেলিত হয়েছে। কি সেই বার্তা? তিনি মাদ্রাজে এক সভায় বলেছিলেন, “এমন এক ব্যক্তির আবির্ভাবের সময় হইয়াছিল যিনি একাধারে শঙ্করের মহতি মেধা ও চৈতন্যের বিশাল অনন্ত হৃদয়ের অধিকারী হইবেন,যাহার হৃদয় ভারতের বা ভারতের বাহিরে দরিদ্র দুর্বল পতিত সকলের জন্য কাঁদিবে, অথচ যাহার বিশাল বুদ্ধি এমন মহৎ তত্ত্বসকল উদ্ভাবন করিবে”।তিনি গুরুকথা শ্রবণ করে উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিলেন। শিব জ্ঞানে জীব সেবা। কি অপূর্ব সেই চিন্তা, জীব মাত্রই শিব ভাবনায় সেবা করা। নৈয়ায়িক, তার্কিক নিমাই গুরু কথা শ্রবণ করতে করতে পাল্টে গেলেন। সবার জন্য সমান অধিকার এর বীজ গুরু তাঁর অজান্তেই রোপণ করেছিলেন। তাই সবার মধ্যেই তিনি কৃষ্ণরূপ দেখতেন। কারো সঙ্গে দেখা না হলেই হাত জোড় করে বলতেন, 'ওম নমো নারায়ণায়'। স্বামীজি দেখলেন দুই অবতার একই কাজের জন্য প্রায় সাড়ে তিনশো বছর অন্তরে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন। তাঁর সমগ্র কর্ম চিন্তায় দুজনের সমন্বয় ঘটলো ।

ভারতবর্ষের সনাতন পদ্ধতিতে যুগের পর যুগে সাধুরা সন্ন্যাস মন্ত্র দেওয়ার সাথে সাথে একটা মন্ত্র দিতেন, প্রেম। এই প্রেমের কোন সীমা নেই। দৃশ্য বা অদৃশ্য, জগতে প্রকট বা অপ্রকট, ছিল অথবা থাকবে। সবার জন্য প্রেম। প্রেম ছাড়া সন্ন্যাস হয় না। এই প্রেম প্রবাহে, একজন সামাজিক অবস্থান না দেখেই বুকে জড়িয়ে নিয়েছেন অচ্ছ্যুৎ, অশীতিপর, জাতকুলহীন মানুষকে। তাদের তপ্ত হৃদয়ে শান্তির জল বপন করেছেন। নাম সংকীর্তনের মিছিল যে জনপদ দিয়ে গেছে, মে বনরাজির মধ্যে দিয়ে নাম আকাশে বাতাসে ধ্বনিত

Society Language and Culture

হয়েছে। সেই মিছিলে মানুষের ঢল ভারতবর্ষের পূর্ব দিক থেকে যাত্রা করে প্রায় সর্বত্র মানুষ আবিষ্ট হয়েছে এই হরিনাম সংকীর্তন এর দ্বারা। ব্রাহ্মণ, শূদ্র, কায়স্ত, তাম্মুলি, সদগোপ, উচ্চ-নীচ বর্ণ ভেদাভেদ নেই। সংকীর্তনের মিছিল দেখে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব মহাপ্রভুর প্রেম সম্পর্কে বলেছিলেন, "চৈতন্যদেবের জ্ঞান—সৌরজ্ঞান, জ্ঞান-সূর্যের আলো। আবার তার ভীতর ভক্তিচন্দ্রের শীতল আলোও ছিল। ব্রহ্মজ্ঞান, ভক্তিপ্রেম দুইই ছিল"। এই বাক্য সাধারণের বোধগম্য হওয়া একটু কঠিন। আমি যে নিজেই বুঝতে পেরেছিলেন, "এই প্রেমের মহিমা আর কি বলিব। এইমাত্র বলিতেছি যে গোপীপ্রেম উপলব্ধি করা বড়ই কঠিন। আমাদের মধ্যেও এমন কোন নির্বোধ এর অভাব নাই, যাহারা শ্রীকৃষ্ণ জীবনের এই অপূর্ব অংশের অদ্ভুত তাৎপর্য বুঝিতে সক্ষম। আর বলিতেছি, আমাদের সহিতই শোণিত সম্বন্ধে সম্বন্ধ অশুদ্বাত্মা নির্বোধ অনেক আছে, যাহারা গোপী প্রেমের নাম শুনিলে যেন উহাকে অতি অপবিত্র ভাবিয়া দশ হাত পিছাইয়া যায়। তাহাদিগকে আমি কেবল এইটুকু বলিতে চাই, আপনার মনকে আগে বিশুদ্ধ করো, তোমাদিগকে ইহাও সরণ রাখিতে হইবে যে, এই অদ্ভুত প্রেম বর্ণনা করেছেন তিনি আর কেহই নহেন, সেই আজন্মশুদ্ধ ব্যাসতনয় শুক। যতদিন হৃদয়ে স্বার্থপরতা থাকে, ততদিন ভাগবতপ্রেম অসম্ভব। উহা কেবল দোকানদারি, আমি তোমায় কিছু দিতেছি, তুমি আমায় কিছু দাও। আর ভগবান বলিতেছেন, যতদিন তুমি এরূপ না করো তাহা হইলে তুমি মরিলে তোমায় দেখিয়া লইব। চিরকাল আমি তোমায় দগ্ধ করিয়া মারিবো। সকাম ব্যক্তির ঈশ্বর ধারণা এই রূপ। যতদিন মাথায় এইসব ভাব থাকে ততোদিন গোপীদের প্রেম জনিত বিরহের উন্মত্ততা লোকে কি করিয়া বুঝিবে? শ্রীমদ্ভগবদগীতা উল্লেখ করে বলছেন, 'একবার একবার মাত্র যদি সেই অধরের চুম্বন লাভ করা যায়! যাহাকে তুমি একবার চুম্বন করিয়াছো, ধরিয়া তোমার জন্য তাহার বিপাশা বাড়িতে থাকে তাহার সকল দুঃখ চলিয়া যায়, তখন অন্যান্য সকল বিষয়ে আসক্তি চলিয়া যায়। কেবল তুমিই একমাত্র প্রীতির বস্তু হও।'[১২] বর্ষকে প্রকৃত জানানোর এই প্রচেষ্টা তাঁর মধ্যে সব সময়ে ক্রিয়া করত। পরিব্রাজক বিবেকানন্দ একজন সাধু নন, তিনি ছিলেন চরক-শুশ্রুতের মত বৈদ্য, যারা দেখেই বুঝতে পারতেন, মানুষটার কি রোগ, সে এর আরোগ্য। তিনি ভারতবাসীর প্রশ্নটা বুঝতেন বলে অহৈতুকী প্রেম সম্বন্ধে কি অসাধারণ প্রাঞ্জল একটা বক্তৃতা দিয়েছিলেন। মানুষ যাতে আত্মস্থ করতে পারে। আত্মস্থ করার শর্ত যে মনকে বিশুদ্ধ করা সে বিষয়ে সজাগ করে দিয়েছেন। শ্রীচৈতন্য তাঁর কাছে এক আদর্শস্বরূপ। শ্রীচৈতন্যের প্রেম, বিয়ে দয়া তিনি তার গুরুর মাধ্যমে কর্তব্য হিসেবে শুধু গ্রহণই করেননি, সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। আজও সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছেন শ্রীরামকৃষ্ণের সন্তানরা-- প্রেম ভালোবাসা নিয়ে।

২

বর্তমান আলোচনায় দ্বিতীয় সত্যদ্রষ্টা হলেন কেশবচন্দ্র সেন(১৮৩৮-১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দ)। উনিশ শতকের ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলনের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। ব্যক্তিত্ব ও নিজস্ব গুণাবলীর দ্বারা তিনি উপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসনাধীনে বাংলা তথা ভারতবর্ষের অন্যতম জাতীয় দার্শনিক, ধর্ম ও সমাজ সংস্কারক ও মনীষী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্বেই বাংলার ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলন নতুন রূপে পরিচালিত হয়েছিল। ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে তিনি বিশিষ্ট স্থান দখল করেছিলেন। প্রাথমিক পর্যায়ে

Society Language and Culture

ব্রাহ্ম আন্দোলন বিভিন্ন নেতার নেতৃত্বে ভিন্ন ভিন্ন রূপলাভ করেছিল। পরবর্তী পর্যায়ে কেশবচন্দ্র সেনের প্রচারিত 'নববিধানের' মাধ্যমে বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের ঐকান্তিক সমন্বয় ভাবনা তৎকালীন যুগে অভিনবত্বের সঞ্চার ঘটিয়ে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্যের এক সুমহান সূত্রকে সংগঠিত করেছিলেন। অন্যদিকে পরম পুরুষ শ্রীচৈতন্যদেব (১৪৮৬-১৫৩৩খ্রিস্টাব্দ) ষোড়শ শতাব্দীতে বৈষ্ণব ধর্ম আন্দোলনের প্রাণপুরুষ রূপে চিহ্নিত ছিলেন। তিনি বাঙালির 'হিয়া অমিয় মথিয়া'রাধাকৃষ্ণের যুগল অবতাররূপে মর্ত্যভূমি অবতীর্ণ হয়ে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত সংসারী- পাপী-তাপী মানুষকে প্রেম ভাবনার মহান আদর্শ দ্বারা সংগঠিত করেছিলেন। উনিশ শতকের ব্রাহ্ম আন্দোলনকারী ও নববিধানের অভিনব সমন্বয়কারী কেশব চন্দ্র সেন পরম-পুরুষ শ্রীচৈতন্যদেব সম্পর্কে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। শ্রীচৈতন্য যে সুমহান প্রেম ভাবনার আলো প্রচলন করেছিলেন তার অন্তর্নিহিত কে কেশবচন্দ্র সেন অনুভব করেছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব বৈষ্ণব ধর্ম আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যে সামাজিক গুরু দায়িত্ব পালন করেছিলেন এবং উদারতার বন্যা বইয়ে দিয়েছিলেন তার বিস্তৃত প্রেক্ষাপট নিয়েও তিনি আলোচনা করেছেন। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্বে ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলন সর্বভারতীয় রূপ পরিগ্রহ করেছিল। সুবক্তা এই মানুষটি ছিলেন ব্রাহ্মসমাজের প্রথম অব্রাহ্মণ আচার্য এবং অন্যতম সত্যদ্রষ্টা। ভাবাবেগ নয়, তাঁর সংস্কার মুক্ত, উদার, প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি ও যুক্তিবাদী মানসিকতার কারণে ব্রাহ্ম আন্দোলন নতুন খাতে প্রবাহিত হয়েছিল। তিনি সামাজিক অস্পৃশ্যতা, জাতিভেদ, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ দূর করে এক ঈশ্বর,এক সংগঠন, এক আচার পরিধি এক মানবধর্ম প্রতিষ্ঠা করতে চেয়ে ছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি যে 'শ্লোক সংগ্রহ'বা ধর্মীয় শিক্ষা ও আদর্শ প্রচার করেছিলেন তার মধ্যে বিভিন্ন ধর্মের বাণী সংকলিত হয়েছিল। তিনি প্রেম ও ভাতৃত্বের সর্বজনীন আবেদনে বিশ্বাসী ছিলেন। মৃত্যুর চার বছর আগে ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে তাঁর প্রচারিত 'নববিধান' এর মাধ্যমে তিনি সর্বধর্ম সমন্বয়ের আদর্শ তুলে ধরেছিলেন। কেশবচন্দ্রের জীবনে অনেকগুলি ধারা এসে মিলিত হয়েছিল। সেগুলি তাঁর জীবনের বাইরে দিয়ে প্রবাহিত না হয় প্রেরণার আকারে তাঁর সজীব মনে সমন্বয়ের ধারায় পরিণত হয়েছিল। ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি এক নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর মাতৃকুল ছিল শাক্ত ধর্মাবলম্বী। বেদ ও গীতা ছিল তাঁর প্রিয় ধর্মগ্রন্থ। খ্রিষ্ট ধর্ম এবং ওল্ড টেস্টামেন্ট-এর প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিল অপরিসীম। অন্যদিকে তিনি রামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে এসে আধ্যাত্মিকতার আদর্শে মুগ্ধ হয়েছিলেন। আবার তিনি 'What is Brahmonism?--রাজনারায়ণ রায়ের লেখা প্রবন্ধ পাঠ করে ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়েছিলেন। একটি বক্তৃতায় তিনি তাঁর অন্তরের এই সমন্বয়কে সুস্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত করেছেন, "The Lord Jesus is my my will, Socrates my head, Chaitanya my heart, the Hindu Rishi my soul and the Philanthropic Howard my right hand". কেশবচন্দ্র কেবলমাত্র নিজ ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ না থেকে সর্বধর্মের সব সাধককে এক সমন্বয়ের সূত্রে বেঁধে ছিলেন—"Recognises in all prophets and saints a harmony"।[১৩] কেশবচন্দ্র তাই ছিলেন সর্বধর্ম সমন্বয়ের এক মূর্ত প্রতীক। অন্যতম সত্যদ্রষ্টা। কাজেই তাঁর ভাবনায় ' স্ব' এবং 'পর'-এর ভিন্নতে একখণ্ড পরিবার আত্মপ্রকাশ করেছিল। এখানেই তার দৃষ্টিভঙ্গির অনন্যতা। তাঁর প্রতিষ্ঠিত নববিধান সব ধর্মের মানুষই ছিল এক অখণ্ড পরিবারের সদস্য। তিনি আলাদা করে কোনো ধর্ম বা কোন ধর্ম সম্প্রদায়কে দেখতে চাননি। কেশবচন্দ্র সেন এর আত্মজীবনী থেকে জানা যায় যে, তিনি একাধারে বিশ্বাস ও যুক্তির প্রতি

Society Language and Culture

বিশেষভাবে আস্থাশীল ছিলেন। আর এ প্রসঙ্গেই তিনি দুজন মহান ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব যীশুখ্রীষ্ট ও শ্রীচৈতন্যের প্রতি আকৃষ্ট হন। তাঁর চরিত্র ও ব্যক্তিগত গুণাবলী বিকাশে শ্রীচৈতন্য সংস্কৃতি এবং খ্রীষ্টীয় ও সংস্কৃতি বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল। India asks,'Who is Christ' প্রবন্ধেও কেশবচন্দ্র যীশুখ্রীষ্ট ও চৈতন্যের প্রতি এইরকম শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন। তিনি সংকীর্ণ ধর্মীয় ভাবনায় আবর্জনা থেকে যীশুখ্রীষ্টকে প্রকৃত যোগী আখ্যা দিয়েছেন। কারণ যীশুখ্রীষ্ট ছিলেন ভারতের জাতীয় ভাবনার মূর্ত প্রতীক। এ প্রসঙ্গেই তিনি ষোড়শ শতকে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতির প্রাণপুরুষ 'চন্ডালোহপি দ্বিজশ্রেষ্ঠ হরিভক্তি পরায়ণ:'ভাবনার উদ্গাতা শ্রীচৈতন্যদেবের প্রতি দেশবাসীকে শ্রদ্ধাশীল হওয়ার বার্তা প্রেরণ করেছিলেন—'You have learnt to give the homage of your hearts to dear Chaitanya, the prophet of Nuddea"।[১৪]

বস্তুত শ্রীচৈতন্যদেব ১৪৮৬ খ্রিস্টাব্দে ফাল্গুনী পূর্ণিমায় নবদ্বীপধামে অবতীর্ণ হয়ে তুর্কিদের দ্বারা বিজিত হতাশাগ্রস্ত দিশাহীন বাঙালি জাতিকে মুক্তির পথ দেখাতে সক্ষম হয়েছিলেন। হিন্দু সম্প্রদায়ের বর্ণ শ্রেষ্ঠ মানুষেরা তথাকথিত নিম্নবর্গীয়দের ক্ষেত্রে উদার দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় না দিয়ে ধর্মীয় ভন্ডামি, শোষন, অত্যাচার, নিপীড়ন, অবিচারকে পৃষ্ঠপোষকতা দান করেছিল। উচ্চবিত্ত মানুষেরা ভোগবিলাসে নিমগ্ন ছিল এবং সাধারণ মানুষ লোকাচারের পাকচক্রে কেবলই ঘুরে ঘুরে মরছিল। সমাজ সংসার প্রেমভক্তি শূন্য শুষ্ক যান্ত্রিকতায় যখন পর্যবসিত হয়েছিল, তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আবির্ভূত হয় বাঙালি জাতিকে এক আলোকোজ্জ্বল পথের সন্ধান দিয়েছিলেন। যা ইতিপূর্বে কখনো সম্ভবপর হয়নি। বৈষম্য আর শতধা বিভক্ত ব্রাহ্মণ্য নিয়ন্ত্রিত সমাজব্যবস্থায় সাধারণ মানুষ সহ নারীকে তার আপন ভাগ্য নির্ণয়ের সুযোগ ষোড়শ শতকের বিদেশি শাসনের নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুই একমাত্র দেখাতে পেরেছিলেন। প্রেম, প্রীতি ও ভালোবাসার মাধ্যমে ভেদাভেদহীন ও জাতপাতহীন সমাজ ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান এবং প্রথম আধুনিক পুরুষ ছিলেন শ্রীচৈতন্যদেব। আচার-সর্বস্বতা নয়, অন্তর ধর্মের শ্রেষ্ঠত্বকে উদ্ঘাটন করে তিনি মানুষকে 'হরি'নামের বীজ মন্ত্রে দীক্ষিত করতে পেরেছিলেন। তাঁর মধুর ব্যক্তিত্বের প্রভাবে সমাজের অভিজাত,-অন্ত্যজ , উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ ঘুচে গিয়ে ছিল। তিনি দীপ্ত কণ্ঠে উচ্চারণ করেছিলেন 'চন্ডাল নহে যদি কৃষ্ণ বোলে'। বিপ্র বিপ্র নহে যদি অসৎ পথে চলে'। তাঁর প্রচারিত প্রেমভক্তি প্লাবনে জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা, ধনবৈষম্য-অর্থবৈষম্য ইত্যাদি এবং রাষ্ট্র ব্যবস্থায় বৈষম্য ঘুচে গিয়ে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তাঁর প্রতিষ্টিত মানবতাবাদের উজ্জীবনে পুরনো ভাবনা ধ্যান-ধারণার জীর্ণ কঙ্কাল থেকে নতুন মূল্যবোধ অভূতপূর্ব রূপে অপরূপ লাবণ্যে সমাজকে নবগঠিত উর্বরতা দান করেছিল। এই ধরনের বৈপ্লবিক পরিবর্তন এর মূলমন্ত্র ছিল প্রেম। এবং এই প্রেম মানুষকে কেন্দ্র করেই পত্রেপুষ্পে পল্লবিত ও বিকশিত হয়েছিল। আর এই সাংস্কৃতিক দর্শন ও ধর্মীয় ভাবনা কেশবচন্দ্র সেনকেও নানাভাবে প্রভাবিত করেছিল। তাঁর আত্মদর্শন ও চিন্তাধারা ধর্ম সাধনাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। উনিশ শতকীয় প্রেক্ষাপটে ভারতীয় ধর্ম সাধনা ও সমাজ নির্ণয়ের এক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন কেশব চন্দ্র সেন। তিনি শ্রীচৈতন্য দর্শন ও সংস্কৃতি এবং খ্রিস্টীয় চিন্তা চেতনা দ্বারা ব্রাহ্ম আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী ও জোরদার করে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন।

Society Language and Culture

এ প্রসঙ্গে বাংলার অন্যতম বিশ্বসেরা মনীষী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শ্রীচৈতন্য সম্পর্কে মূল্যায়ন প্রাণী প্রানিধানযোগ্য। মহামনিষী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীচৈতন্যের মানবতাকে উপলব্ধি করেছিলেন। 'বৈষ্ণব ধর্ম এক ভাবির উচ্ছ্বাসে সাময়িক অবস্থাকে লংঘন করিয়া তাহাকে (বাংলার শাক্তধর্মকে) প্লাবিত করিয়া দিয়াছিল। সাময়িক অবস্থার বন্ধন হইতে এক বৃহৎ আনন্দের মধ্যে সকলকে নিষ্কৃতি দান করিয়াছিল। শক্তি যখন সকলকে পোষণ করিতেছিল, উচ্চ যখন নিজকে দোলন করিতেছিল, তখনি সে প্রেমের কথা বলিয়াছিল। তখনই সে ভগবানকে তাহার রাজসিংহাসন হইতে আপনাদের খেলাঘরে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছিল, এমনকি প্রেমের স্পর্ধায় সে ভগবানের ঐশ্বর্যকে স্পর্শ করিয়াছিল। ইহাতে যে ব্যক্তি তৃণাদপি নীচ সেও পবিত্র হইল'।১৫ চৈতন্যের সর্বধর্মের বাঁধন ভেঙে বিশ্বাস ও ভালোবাসার সূত্রে গ্রথিত মানবতাবাদকে সমাজ জীবনে আহ্বান করেছিলেন। যবন হরিদাস ও তাঁর কোলে স্থান পেয়েছিলেন। উচ্চপদস্থ রাজ কর্মচারীরাও তাঁর আহবানে প্রেম ধর্মে নিজেদের নিবিষ্ট রেখেছিলেন। নবদ্বীপের কুখ্যাত গুন্ডা জগাই -মাধাইকেও তিনি প্রেমধর্মে দীক্ষিত করে তাদের জীবনের ও মানসিক চিন্তাধারার পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। চৈতন্যের এই বিশাল ক্ষমতা ও শক্তি কেশবচন্দ্রকেও ভীষণভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। কেশবচন্দ্র চৈতন্যদেবের অবদানকে যেমন শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন তেমনি তিনি চৈতন্যদেবের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। চৈতন্যদেবের প্রেম ধর্মের অন্তর্নিহিত উদারতা তার প্রতি আস্থাশীল থেকেছেন আজীবন কেশবচন্দ্র। ব্রাহ্ম আন্দোলনের সময় তিনি চৈতন্য প্রবর্তিত পথে সামাজিক বিভেদ কে মানুষকে অগ্রগতির পথে ধাবিত হওয়ার জন্য উৎসাহিত এবং উৎসারিত করেছিলেন। চৈতন্য প্রবর্তিত নাম সংকীর্তন কে ব্রাহ্মসমাজে অনুপ্রবেশ করিয়ে ব্রহ্মসংগীত কে আরো বেশি গ্রহণযোগ্য এবং সমাজ উপযোগী করেছিলেন। ব্রহ্মসংগীত এর ফলে সমৃদ্ধতর হয়েছিল। এছাড়া নববিধান প্রসঙ্গে বারংবার দেশীয় প্রেমের ঠাকুর শ্রীচৈতন্যদেবের কথা তিনি স্মরণ করেছেন অবিচল চিত্তে। চৈতন্যদেবকে কখনো 'Dear' কখনো 'my heart'ইত্যাদি ঐকান্তিক বিশ্লেষণে ও বিশেষণে বিশেষায়িত করেছেন। শ্রীচৈতন্য সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেছেন,-- "Chaitanya, by the power of love and faith, achieved triumphs which must appear to be a wonder to my educated countrymen. Such is the marvellous power, and such the incomprehensible greatness, of prophet-reforms".[১৬]

৩

আমরা জানি, ভারতবর্ষের ধর্ম ও সামাজিক সহ সাংস্কৃতিক ইতিহাসে শ্রীচৈতন্যদেবের অবদান সর্বজন স্বীকৃত। তাঁর প্রচারিত প্রেমভক্তির ধর্ম, সকল মানুষের প্রতি তাঁর গভীর মমত্ববোধ দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে মানবজাতির কাছে আজ এক অক্ষয় অমূল্য সম্পদ। অন্যদিকে, আরেকজন বিখ্যাত বিশ্বশ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক দার্শনিক ও সত্যদ্রষ্টা মহাত্মা গান্ধী ও স্বকীয় প্রতিভা ও চিন্তাধারার দ্বারা বিশ্ববন্দিত। রাষ্ট্র, অর্থনীতি,সমাজনীতি সকল ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। মহাত্মা গান্ধী সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, "মহাত্মাজী এমন একজন কৃষকের সঙ্গে মিলছে পেরেছিলেন, যার নিয়ত প্রচেষ্টা ছিল মানবের ন্যায্য অধিকারকে বাধামুক্ত করা। সৌভাগ্যক্রমে এই ঋষি টলস্টয়ের কাছ থেকে মহাত্মা গান্ধী খ্রিস্টান ধর্মের অহিংসা নীতির বাণী যথার্থভাবে লাভ করেছিলেন"।

Society Language and Culture

গান্ধীজী তাঁর জীবনে টলস্টয়ের প্রভাব স্বীকার করে নিয়ে যে 'The Kingdom of God is within You' বইটি পড়ে তিনি হিংসার পথ থেকে সরে এসে অহিংসায় বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলেন। প্রবল পরাক্রমশালী ব্রিটিশদের রাজত্বে গান্ধীজী ছিলেন ভারতবর্ষের এক বিরাট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব স্বাধীনতাকামী ভারতবর্ষের একজন শীর্ষ নেতা। গান্ধীজীর মদ ও পথের পথিক যারা তারা মনে করেন তিনি ছিলেন দিয়ে সকালের ঊর্ধ্বে এক মহানুভব মহাপুরুষ, এক মহাত্মা--যার ভেতর দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে সমস্ত ভারতের অপমানিত আত্মা, অগণিত লোকের দুঃখ বেদনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা। বহু বছরের সাধনা ও সেবার দ্বারা তিনি নিজেকে ভারতের আত্মার সাথে একাত্ম করতে পেরেছিলেন।[১৭] এইরূপ এক মহাপুরুষের কর্মময় জীবনের সাথে যুগাবতার শ্রীচৈতন্যের কর্মকাণ্ডের কি কোন সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়? এ প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবে ওঠাই বাঞ্ছনীয়। আরো ভালো ভাবে বললে বলা যায়--ভারতে গান্ধীজীর রাজনৈতিক সংগ্রাম অথবা জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা দাড়ি নিয়ে সামাজিক আন্দোলনের নানা পর্যায়ের বেশ কিছু ঘটনার সাথে প্রায় চারশো বছর পূর্বের শ্রীচৈতন্যদেবের সন্ন্যাস পূর্ব জীবনের কিছু কিছু ধর্মীয় ও সামাজিক কর্মকান্ডের কোনরূপ সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় কিনা? গান্ধীজীর ওপর চৈতন্যদেবের আদৌ কোনো প্রভাব অথবা বৈষ্ণব ধর্মের কোনো প্রভাব ছিল কিনা? গান্ধীজী দৃষ্টিতে চৈতন্যদেব কেমন ছিলেন? যখন দাদা বিশ্বরূপ যৌবন বয়সে সন্ন্যাস নিয়ে গৃহত্যাগ করেন তখন ও তিনি চৈতন্যদেব বলে পরিচিত হন নি। ক্রমশ সর্ব শাস্ত্রে শ্রীচৈতন্যের পাণ্ডিত্য লাভ ও অধ্যাপনা শুরু হয়। একদিকে অদ্ভুত শ্রেষ্ঠ পাণ্ডিত্য, অন্যদিকে শ্রীচৈতন্যের অপূর্ব বিনয় ও সহনশীলতা তাঁকে মহান করেছে। অধ্যাপনার সুকৌশলের জন্য শ্রীচৈতন্যের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি সব দিকে ব্যাপ্ত হয়। এমন সময় কাশ্মীর দেশীয় কেশব মিশ্র নামক দিগ্বিজয়ী পন্ডিত এর সঙ্গে শ্রীচৈতন্যের তীব্রতর তর্ক যুদ্ধ হয় এবং তিনি তাকে পরাজিত করেন। এই প্রসঙ্গে আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো--পুরীর শ্রেষ্ঠ পন্ডিত সার্বভৌম ভট্টাচার্য শ্রীচৈতন্যের কাছে জ্ঞানমার্গ বিষয়ক তর্ক যুদ্ধে পরাজিত হন এবং তাঁর আত্মোপলব্ধি হয়। শ্রীচৈতন্যের এই লীলা কাহিনী শুনে যে কেউ মুগ্ধ হবেন। পূর্বে কথিত কাশ্মীর দেশীয় দিগ্বিজয়ী পন্ডিত এবং সার্বভৌম পন্ডিত দুজনেরই শেষে একই অবস্থা হয়েছিল শ্রীচৈতন্যের সংস্পর্শে এসে। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত শ্রীচৈতন্যদেবের ব্যবহারে রয়েছে পূর্ণ পাণ্ডিত্যের সাথে গৌরবহীন অহংকার শূন্য বিনম্র ভাব, অর্থাৎ বিনয়ের পরাকাষ্ঠা। তাই শ্রীচৈতন্য হলেন বিনয়ের অবতার। এটাই পরম বৈষ্ণব মনের ভাব। এখানেই গান্ধী প্রসঙ্গ আসতে পারে। গান্ধীজী খুব স্থির বিনম্রভাবে কথা বলতেন। আচরণে খুবই বিনয়ী ছিলেন। কোন কিছুর জন্য অহংকার করা বা নিজেকে গৌরব দান করার কথা গান্ধীজীর জীবনে পাওয়া যায় না। সেই দিক দিয়ে বিচার করলে গান্ধীজী ছিলেন একজন পরম বৈষ্ণব। কৈশোর যৌবনে অধ্যায়নের সাথে সাথেই নানা ক্রিয়া-কলাপ এর মাধ্যমে প্রেমভক্তি ভাব আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সমাজের নানা স্তরের মানুষকে নিয়ে শ্রীচৈতন্যদেব মহানাম সংকীর্তন মেতে উঠতেন। চৈতন্যদেবের ধর্ম হল প্রেমভক্তি নাম সংকীর্তন সমাজের সকল মানুষকে নিয়ে। নাম সংকীর্তন এর সময় গৌরাঙ্গ -গৌরহরি -নিমাই এর পাশে অনেক পার্ষদ থাকতেন, যাদের মধ্যে নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত আচার্য অন্যতম(এছাড়া শ্রীধর পন্ডিত, গদাধর প্রমুখ উল্লেখযোগ্য ছিল)। ভক্তরা এই তিনজনকেই তিন প্রভু বলতেন। শ্রীচৈতন্যদেব ছিলেন প্রভুদের প্রভু অর্থাৎ মহাপ্রভু। চৈতন্যদেবের প্রভাবে বঙ্গের তথা গৌড়ের বৈষ্ণব সমাজের অতুলনীয় ভক্তিরঙ্গের খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম বঙ্গের সীমানা অতিক্রম করে জাতীয় রূপ পরিগ্রহ করে।

Society Language and Culture

এই সহিষ্ণুতার কোথায় গান্ধীজী প্রসঙ্গ এসে পড়ে। গান্ধীজী বৈষ্ণব পরিবারে জন্মগ্রহন করেছিলেন এবং খুবই সহিষ্ণু ছিলেন। গান্ধীজীর মধ্যে বৈষ্ণব সুলভ প্রেমের প্রভাব খুবই ছিল--গান্ধীজী একজন ভক্ত ছিলেন কিন্তু তিনি শুধুই ভক্ত ছিলেন তাই নয়। তিনি পৃথিবীতে একজন শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা ছিলেন। জাত পাতের ভেদাভেদহীন ধর্ম চৈতন্যদেবকে সর্ব সাধারণের কাছে দারুণ জনপ্রিয় করে তুলেছিল। আসলে জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা ও নানা ধরনের কুপ্রথার বিরুদ্ধে চৈতন্যদেবের আন্দোলন প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণ প্রেম ভক্তি মাখা ধর্মীয় বাতাবরণের মধ্য দিয়ে ধর্মীয় সামাজিক আন্দোলন। তিনি সমাজের বিধি নিষেধের বেড়াজাল ভেঙে সমাজের নিচু তলার সমস্ত মানুষকে কাছে টেনে মানবপ্রেমে আলিঙ্গন করলেন কীর্তনের মাধ্যমে। কীর্তনমঞ্চ হল যেন সকল মানুষের সমান অধিকারের ভিত্তিতে এক মিলনস্থল। এক সামাজিক-সাম্যের আদর্শ থেকে চৈতন্যদেব চেয়েছিলেন সমাজের নিম্নবর্গের মানুষদের, অস্পৃশ্যতদের সমমর্যাদা প্রদান করতে এবং তার করতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। একই কারণে এখানে গান্ধীজীর নাম উল্লেখ করতে হয়--যিনি আপামর মূর্খ দরিদ্র নিরন্ন লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন এবং বিশেষ করে নিম্নবর্গের মানুষদের, অস্পৃশ্যদের সমমর্যাদা প্রদানের আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। তিনি তাদের হরিজন নাম দিয়ে তীব্র আন্দোলন করেছিলেন উচ্চবর্ণের বিরুদ্ধে।[১৮] এক্ষেত্রে চৈতন্যদেব ও গান্ধীজীর ভেদাভেদহীন ধর্মীয়-সামাজিক ভাবধারার মধ্যে সাদৃশ্য দেখা যায়। নানা সামাজিক বাধা সত্ত্বেও তাঁর বিশেষ শক্তির সাহায্যে চৈতন্যদেব শূদ্র বা অস্পৃশ্যদের সহজেই কীর্তন মঞ্চে ছ এনেছিলেন। পুরীর মন্দিরের দ্বার খুলে দিয়েছিলেন স্পৃশ্য ও অস্পৃশ্য সকলের জন্য। কিন্তু হরিজনদের নিয়ে সংগ্রাম গান্ধীজীর কাছে ছিল এক দুরূহ ব্যাপার। চৈতন্যদেবের পার্ষদদের তালিকায় ব্রাহ্মণ রায় ছিলেন সংখ্যায় বেশি। ব্রাহ্মণদের সামাজিক প্রতিষ্ঠা চৈতন্যদেবের ভক্তিধর্মের প্রচারের পক্ষে হয়তো কিছুটা সাহায্য করেছিল। তবে চৈতন্য সহচর তালিকায় ব্রাহ্মণরা সংখ্যায় কম ছিলেন না। কায়স্থ, শূদ্ররাও তার পার্ষদ ছিলেন। চৈতন্যদেবের অনেক পার্ষদ ছিলেন কায়স্থ, যাদের ব্রাহ্মণ শিষ্যও ছিল। চৈতন্যদেব কে ঘিরে সেযুগের সমাজে এক ন্যায় ভিত্তিক, সাম্যভিত্তিক মুক্ত মানবিক ধর্মীয় পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছিল। সেটা ছিল এক নিঃশব্দ বিপ্লব । তাঁর ধর্ম বিপ্লব এমনই এক গভীর সমাজ বিপ্লবের রূপ নিয়েছিল যে, সমগ্র ভারতের ইতিহাসে তা এক অভূতপূর্ব ঘটনা হয়ে গেছে। তাঁর প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্মের গুরুত্ব শুধু আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকলে তা এমন কালজয়ী হয়ে উঠতে পারত না। শাসকবর্গের অপশাসন এবং সামাজিক অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে তিনি তাঁর ভক্তিবাদী ধর্মের মাধ্যমে সকলের সঙ্গে সমান ভাবে মাথা তুলে দাঁড়ানোর অধিকার দিয়েছিলেন। তিনি জানতেন, যুগ যুগ ধরে অপশাসিত, অবহেলিত ও নিয়তিগ্রস্ত মানুষদের মুক্ত প্রেম ভক্তির কথা বলে সহজেই কাছে টানা যাবে। নাম-সংকীর্তন তাদের মিলিত ঐক্যবদ্ধ করার একটি মাধ্যম। ভারতের সাধারণ মানুষ ভক্তি কে পরমার্থিক মূল্য দিয়ে থাকেন। সেই সঙ্গে ব্রাহ্মণ্যধর্মের বাড়াবাড়ি ও ছুৎমার্গ ও তাদের ভালো লাগে নি। চৈতন্যদেব জানতেন, এই ভক্তির বাধা বন্ধনহীন পথেই তাদের মেলাতে হবে। এই সম্মিলিত মানুষরাই হয়ে উঠবেন বিপুল এক সামাজিক শক্তি। সেই শক্তির উৎস হবে ভক্তিপরায়ণ, ধর্মপ্রাণ ভারতের সনাতন ঐতিহ্য। সুলটান বাদশা নবাবরা এরপর আর কোনভাবেই তাদের ধর্ম জনসাধারণের ওপর চাপিয়ে দিতে পারবেন না। শ্রীচৈতন্যদেবের শক্তির উৎস ছিলেন এই জনগণ।[১৯] এখানেও গান্ধীজী সমভাবে প্রাসঙ্গিক। ভারতবর্ষের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে গিয়ে গান্ধীজী যেভাবে সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন

Society Language and Culture

পরিচালনা করেছিলেন, তা দেখে বোঝা যায় ভারতে জনগণই ছিল গান্ধীজীর শক্তির উৎস। তিনি প্রেম ও আত্মার শক্তি দ্বারা মানুষের মন জয় করতে সমর্থ হয়েছিলেন। সেরকমভাবে ধর্মীয় সামাজিক আন্দোলনের জন্য চৈতন্যদেব কে দারুন প্রতিরোধ ও নানা বাধার সম্মুখীন (দেশীয় শাসকবর্গ যেমন-চাঁদ কাজী এবং কিছু উচ্চবর্ণের মানুষের কাছ থেকে) হতে হয়েছিল। তিনি এই বাধা প্রতিরোধের মাধ্যমে অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এজন্য তিনি সাধারণ মানুষের কাছে আরও জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। অনুরূপভাবে পরাধীন ভারতে নানা সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন করতে গিয়ে গান্ধীজিকে প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। বিদেশি শাসকবর্গের বিরুদ্ধে গান্ধীজিকে প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয়। বিদেশি ব্রিটিশ শাসকের বিরুদ্ধে গান্ধীজিকে লড়তে হয়েছিল অহিংস অসহযোগ ও সত্যাগ্রহের মত অস্ত্রের মাধ্যমে। অহিংসার প্রশ্নে প্রবল মতপার্থক্য থাকায় তিনি সকল সাধারণ মানুষের কাছে প্রিয় হতে পারেননি। জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা ইত্যাদি সামাজিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে উচ্চবর্ণের একশ্রেণীর মানুষের বিরুদ্ধে লড়াই করে তিনি ভারতের নিম্নবর্গের সাধারণ মানুষের কাছে জনপ্রিয় হয়েছিলেন।

শ্রীচৈতন্যদেবের ভাবান্দোলনের অন্যতম প্রিয়া কান্ড হলো নাম- সংকীর্তন। তাঁর প্রভাবে নাম সংকীর্তন এর মধুর ধারায় নবদ্বীপের আকাশ বাতাস মুখরিত হয়েছিল। সেই সময় স্থানীয় শাসনকর্তা চাঁদ কাজী আইন করে এই কীর্তন গান গাওয়া নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন। এর বিরুদ্ধে শ্রীচৈতন্য তার অনুগামীদের একত্রিত করে আইন অমান্য করে কীর্তন করতে করতে চাঁদ কাজীর বাড়ির অভিমুখে যাত্রা করলেন এবং কাজীর বাড়ির দরজায় গিয়ে বসে পড়লেন। এরপর চৈতন্যদেবের যুক্তিজালে পরাস্ত হয়ে কাজী আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। কীর্তন বন্ধের ফরমান কাজী তুলে নিতে বাধ্য হন। গান্ধীজীর প্রসঙ্গটি উল্লেখের দাবি রাখে। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে গান্ধী ভারতবর্ষে বিদেশি শাসকের বিরুদ্ধে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করেন। গান্ধীজী তাঁর অসংখ্য অনুগামীদের নিয়ে ডান্ডি অভিযান শুরু করেন। ডান্ডি তে প্রথম লবণ আইন অমান্য করেন ও তিনি গ্রেফতার হন। জেল থেকে তিনি মুক্তিলাভ করেন। প্রশাসন নতি স্বীকার করে আইন প্রত্যাহার করে নেয় এবং গান্ধীজীর নেতৃত্বে আইন অমান্য আন্দোলন ফলপ্রসূ হয়।[২০] এই দুটি ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যে সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। মহাশক্তিমান চৈতন্যদেবের শক্তি কাছে এলে সার্বভৌমের মত পণ্ডিতরাও পরাজিত হয়ে শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাহলে কি সেই শক্তি? চৈতন্যদেবের সৌম্য ব্যক্তিত্ব, তাঁর বিনম্র অহংকার হীন অগাধ পাণ্ডিত্য, তাঁর নৈতিক শক্তি-এগুলি সবই উচ্চস্তরের মানবিক শক্তি। নাকি তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তি--যা অতি মানবিক শক্তি, যা উচ্চ পর্যায়ের সাধকের থাকে। অবশ্য পরম ভক্তের কাছে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শক্তি হল ভগবত শক্তি বা অলৌকিক শক্তি। আর যদি সাধারণভাবে ধরা যায় তাহলে, চৈতন্যদেবের শক্তির উৎস হল ভক্তিরসসঞ্জাত বা সাধনা লব্ধ আধ্যাত্মিক শক্তি, মা ভারতের বা প্রাচ্যের মুনি-ঋষিদের ছিল। ভারতে রাজনৈতিক আন্দোলন ও অন্যান্য নানাবিধ ভিতর দিয়ে গান্ধীজী অহিংসা ও মানবিকতার এক সুমহান আদর্শ রেখে গেছেন। যদিও এ ব্যাপারে নানা তর্ক-বিতর্কের অবকাশ রয়েছে। তবে যারা গান্ধীজীর মত ও পথের সমর্থক অর্থাৎ গান্ধীবাদী, তাঁরা কিন্তু মনে করেন, গান্ধীজী হলেন এযুগের এক সুমহান মানবিক আদর্শের অত্যুজ্জ্বল বিশ্বপথিক। আর এক জায়গায় ভারতের অন্যান্য ধর্ম গুরুর সাথে শ্রীচৈতন্য কে গান্ধীজী Saint বলে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন—"With the growth of village mentality the

Society Language and Culture

leaders will find it necessary to tour in the villages and establish living touch with them. Moreover, the companionship of the great and the good is available to all through the works of Saints like Chaitanya, Ramakrishna, Tulshidas, Kabir, Nanak, Dadu, Tukaram".[২১] গান্ধীজীর দৃষ্টিতে চৈতন্যদেব কিরূপ ছিলেন তা উপরের উদ্ধৃতি গুলিতে স্পষ্ট। গান্ধীজীর শ্রীচৈতন্যদেবের কর্মকাণ্ড ভাবধারার মধ্যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে যে সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় তা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। আইন অমান্যের ক্ষেত্রে যে সাদৃশ্যটি দেখা যায়, তা নিছক দুটি ঘটনা মাত্র। কিছু সাদৃশ্যের ক্ষেত্রে প্রভাব আছে বলে মনে হতে পারে। যদিও কোন কিছু সাদৃশ্য, প্রভাবের প্রমাণ নয়। এখন গান্ধীর উপর চৈতন্যদেবের প্রভাব আদৌ ছিল কিনা এ আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রথমেই বলতে হয় গান্ধীজীর ভারতের সমস্ত ধর্মগুলো পর ও ভারতের সনাতন ঐতিহ্যের ওপর প্রচণ্ড শ্রদ্ধাভক্তি ছিল। বিশ্বাস ছিল। তাঁর নিজের ভাষায়, "সকল ধর্ম গুরুর সত্য বাণীতেই আমি বিশ্বাস করি"। গান্ধীজীর 'অনাসক্তি যোগ'চটি গীতার গুজরাটি অনুবাদ। তাঁর ভাষায়— "গত ৩৮ বছর হইতে আমি গীতার পথে চলার জন্য চেষ্টা করিতেছি বলিয়া আমার এই অনুবাদের কিছু মূল্য আছে"। তে বোঝা যায় গান্ধীর কৃষ্ণভক্তি ভালোই ছিল। আবার উত্তর ভারতের রামানন্দ সম্প্রদায়ের তুলসীদাস বিরচিত 'রামচরিতমানস'কণ্ঠটি সম্পর্কে গান্ধীজী বলেছেন- "রামায়ণের ওপর আমার গভীর টানো ভক্তি জন্মে। তুলসসীদাসের রামায়ণ আজ আমার দৃষ্টিতে ভক্তি মার্গে এর সর্বোত্তম গ্রন্থ"।[২২] কে বলা যায় গান্ধীর রামভক্তির প্রতিও যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। চেয়ে গান্ধীজীর ওপর শ্রী রাম ও শ্রীকৃষ্ণের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। এর পরবর্তী কালের শ্রীচৈতন্য সহ সকল ধর্ম গুরু তাঁর মনে শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠা ছিলেন। বৈষ্ণব পরিবারে জন্ম হওয়ার কারণে গান্ধীজী বৈষ্ণব ভাবধারার কিছু পরোক্ষ প্রভাব তাঁর ওপর থেকে থাকতে পারে। তবে, অস্পৃশ্যদের কাছে টেনে সমাজে তাদের সমমর্যাদায় অভিষিক্ত করার ভাবধারাটির নিরিখে শ্রীচৈতন্যদেবের উত্তরসূরী ছিলেন মহাত্মা গান্ধী। এই ক্ষেত্রে চৈতন্যদেবের চৈতন্য ভাবধারা প্রসূত চৈতন্য দর্শন বৈষ্ণব সংস্কৃতির কিছু পরোক্ষ প্রভাব গান্ধীজীর ওপর পড়েছিল এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

শ্রীচৈতন্যদেবের বিশিষ্টতা প্রেম ভক্তি প্রচার। যদিও হিন্দু দর্শনকে মানুষের চাহিদা অনুযায়ী চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে, তার নামকরণ চতুর্বর্গ। এই চতুর্বর্গ হলো ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ। যদি কোন সাধারন সংসারী মানুষকে জীবনের অভীষ্ট সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়—অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সে অর্থ ও কামনা-বাসনা করবে। ধর্ম ও মোক্ষ অর্থাৎ মুক্তি এর ওপরের ধাপ, সাধকরা চান এই দুই বর্গ। চৈতন্যদেব প্রচার করলেন পঞ্চমী মানুষের অভীষ্ট লক্ষ্য । এই পঞ্চম বর্গ হল প্রেম। সবার ওপরে তিনি প্রেমকে স্থান দিলেন। কার মূল উৎস মানুষ এবং মানবপ্রেম। মহাত্মা গান্ধী সারা পৃথিবী কে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের পথ দেখিয়েছিলেন বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকের গোড়ার দিকে। তার চারশো বছর পূর্বে নবদ্বীপের কাজিরা দেশের বিরুদ্ধে যখন গৌরাঙ্গ নবদ্বীপ থেকে একযোগে হরিনাম সংকীর্তন করতে একত্রিত করেছিলেন তা যেন অহিংস অসহযোগ এর অপরিণত কিন্তু অহিংস অসহযোগে আছে ক্রোধ, অস্ত্রবিহীন আন্দোলনে আছে প্রতিরোধ। কিন্তু প্রেমের টানে সকলকে আলিঙ্গন করার মধ্যে আছে শুধুই হৃদয়ের ভেসে যাওয়া। পবিত্র কৃষ্ণ নামের জোয়ারে চৈতন্যদেব তেমনি ভাসিয়ে দিয়েছিলেন ভারতবাসীকে। প্রেমের যে কি বিপুল শক্তি সেটি অনুভব করেছিলেন তিনি, আপন মনের প্রবল কৃষ্ণভক্তি থেকেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন মানুষের অন্তরাত্মাকে। কৃষ্ণ কিন্তু দ্বাপর

Society Language and Culture

যুগে প্রয়োজন হলে অস্ত্র প্রয়োগ করেছেন, সে ক্ষেত্রে সর্বদা প্রেমের শক্তিতে বলিয়ান হননি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। চৈতন্যদেব কিন্তু প্রেম শক্তিকেই এবং প্রেমভক্তিকেই সর্বাগ্রে স্থান দিয়েছিলেন। বাঙালি সাহিত্যে, সমাজে, মানসিকতায় মধ্যযুগের এভাবেই চৈতন্যদেব তাঁর মধুররসের জাদু বিস্তার করেছিলেন। উন্মত্ত পাপীষ্ঠ জগাই মাধাই তাকে কলসির কানা ছুড়ে আহত করলেও তিনি ক্রুদ্ধ হননি—তাদের সপ্রেমে বুকে টেনে নিয়েছিলেন। এখানে মনে হয়, ফাল্গুনী পূর্ণিমা গৌরাঙ্গের জন্ম প্রতীকী; চাঁদের আলোর মনোরম উচ্ছ্বাসে যেমন পৃথিবীর সব তুচ্ছতা ভেসে যায়, তেমনি গোরাচাঁদের অসামান্য প্রেমভক্তি নম্রতায় সমৃদ্ধ হয়েছে ভারতবর্ষ। ভারত ছাড়িয়ে পৃথিবীর বহু স্থানে ছড়িয়ে পড়ছে চৈতন্যদেব প্রবর্তিত প্রেম ধর্ম।[২৩]

প্রথাগত ধর্মের থেকে এই মহামানবের প্রবর্তিত ধর্ম পৃথক। ঈশ্বর আমাদের অত্যন্ত প্রিয়-ঈশ্বরকে ভয় পায় অধিকাংশ ধর্মের উপাসক। কিন্তু শ্রী চৈতন্যদেব বৈষ্ণবদের ভালোবাসার ধর্মকে ছড়িয়ে দিলে বিশ্বময়-ঈশ্বরের প্রতি ভয়ের কোন সম্ভাবনা ছিলনা। চৈতন্যদেব; কৃষ্ণের সঙ্গে মানুষকেও তিনি ভালোবাসা দিয়েছেন। ধর্ম আচার বিচারে জর্জরিত ষোড়শ শতকের বাংলায় তিনি জাত, ধর্ম, ধনী, দরিদ্র, ক্ষমতাবান, সাধারণ মানুষ সকলকে সমান দৃষ্টিতে দেখেছেন। শুধু তাঁর সমকালের মানুষেরা নন, আজ পাঁচশো বছর পরেও মানুষ তাঁর থেকে অনেক পিছিয়ে আছে। বিবাহের সময় বাঙালি আজও নিজের জাতের পাত্র পাত্রী খোঁজেন, বিধর্মীকে ভালোবেসে বিবাহ করলে আজও সমাজে ব্রাত্য হতে হয়। লক্ষ্মী পুজো, সতি পুজোর সময় মধ্যবিত্ত বাঙালি হন্যে হয়ে পুরোহিত খোঁজে, সে ক্ষেত্রে বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ হয়েও শ্রীচৈতন্যদেব বুকে টেনে নিয়েছেন যবন হরিদাসকে। ব্রাহ্মণের পাশে রুদ্রকে কেবল পাশাপাশি পংক্তি ভোজনেই বসাননি। চন্ডালকে তিনি ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলেছেন। আধুনিক সাম্যবাদের বহু বছর আগেই এই ভাবনা তাঁকে মহান করেছে। আজও মানুষকে তার বংশমর্যাদা বা অর্থ কৌলিন্য দিয়ে মাপা হয়। বিনয়ী হওয়ার যে শিক্ষা শ্রীচৈতন্য দিয়েছিলেন, ও কয়েক মাইল দূরে মানুষ শিক্ষার,ধনের, বংশের, রূপের গর্বে স্ফীত হয় ভুলেই থাকে নিজ প্রকৃত সত্তাকে। এই অহংকারী ও স্বার্থপর মানুষরাই আবার সন্ত্রাস শাসিত হিংসার পৃথিবীতে বড় অসহায়। কখনো দেখা যায় নিরাপরাধ হাজার হাজার মানুষ বোমা বিস্ফোরণে নিহত হচ্ছে। মহামারী অতিমারির ফলে পৃথিবী ধ্বংস হতে হতে আবার নতুন করে গড়ে ওঠার স্বপ্ন দেখছে যে সময়ে দাঁড়িয়ে, সে সময়ে প্রতিদিনই সংবাদমাধ্যমে হিংসা, ক্রোধ, আর যুদ্ধ যুদ্ধ খেলার নাম করে চলছে রক্তের হোলি খেলা। অকারণে বা সামান্য অর্থের জন্য মানুষ অকাতরে হত্যালীলা ও ধ্বংসলীলায় মেতে উঠেছে। একে বিশ্ব গত কয়েক বছর ধরে দেখছে মানুষ সৃষ্ট অতিমারির ধ্বংসলীলা। তার ওপর পৃথিবীতে নেমে এসেছে যুদ্ধের আবহ। ধ্বংস হতে চলেছে বিশ্বের অপার সৌন্দর্য ও সম্পদ, যেখানে দুধের শিশু ও তার থেকে পরিত্রাণ পাচ্ছে না। তাই মনে হয় এই একবিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকের গোড়ায় দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছে যে, গে দাঁড়িয়ে কেবল মানুষ বলে মানুষকে আলিঙ্গন করার কথা ভাবা মনে হয় আজ অসম্ভব। সারা পৃথিবী কিন্তু এই অস্থির সময়ে ধীরে ধীরে নবদ্বীপধামের চৈতন্য মথিত প্রেম ও অহিংসার বাণী এবং সবরমতী আশ্রমের সেই নিরস্ত্র বীর সেনানী গান্ধীজীর অহিংস আন্দোলনে বিশ্বাস করেছেন। সাধারণ মানুষ একত্রিত হচ্ছেন কায়রোতে, ঢাকায়, নিউইয়র্কে, দিল্লিতে, কলকাতায়। মানুষ বিশ্বাস করছেন স্বতঃস্ফূর্ত অহিংস আন্দোলনে। তেমনি, আমাদের বিশ্বাস ভবিষ্যতের মানুষ উপলব্ধি করবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রেমের ধর্মকে, প্রেমের শক্তিকে। জাতি-ধর্ম-নারী-পুরুষ-বর্ণনির্বিশেষে সকল হিংসা-বিদ্বেষ

Society Language and Culture

তুচ্ছতা বিভেদ ভুলে গিয়ে কেবল মনুষ্যত্বই হবে মানুষের একমাত্র পরিচয়; পাশাপাশি আরও ভালোভাবে মহামারী, অতিমারি ও যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা বন্ধ হয়ে আগামী পৃথিবী নতুনভাবে থ্যনির্দেশিকা:মানব উন্নয়নের পথে পরিচালিত হবে। সেই ভবিষ্যৎ আরো কত দূরে জানা নেই--তবে একদিন না একদিন পৃথিবী আবার নতুন রূপে এগিয়ে যাবে সভ্যতার অগ্রগতির রথে চেপে। হয়তো তার জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে আরো কিছুটা সময়; সেটা হয়তো কয়েক বছর, না হয় কয়েক শত বছর, আর তা না হলে কয়েক হাজার বছর পর।

তথ্যনির্দেশিকা:

১. ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে শিকাগোতে স্বামী বিবেকানন্দের ভাষণ, ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকা থেকে প্রেরিত বার্তা, দশদিশি, সাহিত্য পত্রিকা থেকে সংগৃহীত, পৃ.২৯০।

২. তদেব।

৩.তদেব, পৃ.২৯১।

৪. স্বামী সারদেশানন্দ, শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ১ম সং,১৯৮৬, ১১তম পুনর্মর্দণ, ২০১৩, পৃ. ষোল।

৫. বিবেকানন্দ বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খন্ড, রামকৃষ্ণ মিশন অ্যান্ড কালচার, গোলপার্ক, কলকাতা, ১৯৮৭ সং, পৃ.১৭৭,৫৭৩-৫৭৫।

৬.তদেব।

৭. কাঞ্চন বসু(সম্পা.), বিবেকানন্দ : পত্রাবলী, ২য় ভাগ, রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, ১৯৮৭, পৃ.৪৯৫-৪৯৭।

৮. নির্মলনারায়ণ গুপ্ত (সম্পা.), বাঙালির মনীষায় শ্রীচৈতন্য, রত্নাবলী প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৮৫, পৃ.১০৭, ১০৯-১১৪।

৯. বিবেকানন্দ বাণী ও রচনা, ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ.১৭৫।

১০. উপনিষদের বাণী দিয়ে বুদ্ধদেব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উক্তি, দশদিশি, পূর্বোক্ত,পৃ.২৯৮।

১১. চিরঞ্জয় চক্রবর্তী, স্বামী বিবেকানন্দের শ্রীচৈতন্য, সাহিত্য পত্রিকা দশদিশি ,কলকাতা,২০০৯, পৃ.৩০০-৩০১।

১২. তদেব, পৃ.৩০২।

১৩. তদেব, পৃ.৩০৪।

১৪. সুতপা পাল, কেশবচন্দ্রের চৈতন্য ভাবনা, দশদিশি, পূর্বোক্ত, পৃ.৩০৫।

১৫. Keshab Chandra Sen, Lecture in India; দীপক চন্দ্র, সচল জগন্নাথ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, ১ম সং, ২০০১, পৃ.৮,১২,৮৫।

Society Language and Culture

১৬. A.C. Das, Modern Incarnation of God; ননীগোপাল গোস্বামী, চৈতন্যোত্তর যুগে গৌড়ীয় বৈষ্ণব, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৪০৭ বঙ্গাব্দ, পৃ.৪৬-৫০।

১৭. পান্নালাল দাশগুপ্ত, গান্ধী গবেষণা, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৬,পৃ.৫২, ৫৪-৫৭।

১৮. অরুনাভ গুপ্ত, চৈতন্যদেব ও গান্ধীজী: কিছু সাদৃশ্য কিছু প্রভাব, দশদিশি, কলকাতা, ২০০৯, পৃ.৩১০।

১৯. দেবাশিস বন্দোপাধ্যায়, চৈতন্য চর্চার পাঁচশো বছর, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৮৭, পৃ.৩, ৮৮, ১০৩-১০৪।

২০. অরুনাভ গুপ্ত, পূর্বোক্ত, পৃ.৩১২।

২১. R.K.Prabhu and U.R Rao(Compiled & Edited), The Mind of Mahatma Gandhi, Oxford University Press, pp.365-367.

২২. অরুনাভ গুপ্ত, পূর্বোক্ত, পৃ.৩১৪।

২৩. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ১ম প্রকাশ,১৯৯০, ২য় মুদ্রণ, ২০১১, পৃ.১১৪,১৪৭,১৫৯।

Society Language and Culture